ভিতরের কথা
কেদারনাথ দাস

স্কুলের পেছনের ছোট গলিটায় সোম অপেক্ষা করছিল ওর সদ্য কেনা ঝাঁ চকচকে বাইকটা নিয়ে। স্কুল থেকে বেরতেই জুনকে সওয়ারি করে সবার অলক্ষ্যে বাইকে স্টার্ট দেয়। বাইক তো নয়, যেন পক্ষীরাজ। আজ কিন্তু কোনো কথা শুনব না। নন্দনে বসব। সোমের কথায় আমতা আমতা করে জুন, কিন্তু টিউশনির নাম করে অতক্ষণ। মা ঠিক বুঝে ফেলবে। সোম শুনেও শুনল না। দিকশূন্য মেজাজ এখন ওর। প্রবল গতিতে ভয় পেয়ে জুন যত ওকে চেপে ধরে, তত ওর নেশা লাগে। পাড়া থেকে বেড়িয়ে বড় রাস্তায় পরবার মুখেই দৌড়ে আসা বাচ্চা ছেলেটা একেবারে চাকার সামনে। প্রাণপণে ব্রেক চেপেছিল সোম। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ওর বাইকের চাকা বাচ্চাটার পা থেঁতলে দিল। বহু লোক সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঘিরে ধরল। বুঝতে পারল বাচ্চাটার সাথে ওরও এখন প্রাণের সংশয়। জুনকে নামতে বলে সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেল বাচ্চাটার দিকে। রক্তাক্ত ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে জনতার উদ্দেশে বলল, আমাকে মারবেন পরে। আগে তো একে নিয়ে হাসপাতালে যাই। কেউ চলুন আমার সাথে। একটা বড় মেয়েকে ঠেলে দিল জনতা। বকুল, তুই চলে যা ভাইকে নিয়ে। আর জি কর –এ যাবেন তো? ঠিক আছে যান, আমরাও যাচ্ছি। সোম জুনকে বলল, আজ ফিরে যাও বাড়িতে। দেখলে তো ব্যাপার। লাক খারাপ হলে যা হয়। জুন ফিরে গেল। বাচ্চাটাকে দেখে ওর দিদির ছেলে অর্কর কথা মনে পড়ল। ওর যত খুনসুটি অর্কর সাথে। কাছেই দিদির বাড়ি বলে রোজই একবার করে দেখা হয়।

সন্ধ্যা থেকে ছটফট করছে জুন। কী হল কে জানে। বাচ্চাটা বাঁচবে তো। যদি না বাঁচে? ও ভাবতে পারে না।
রাত আটটার সময় সোমের ফোন- খুব বুদ্ধি করেছি, বুঝলে?
এমার্জেনসিতে একটা ফাঁকা বেডে শুইয়ে বাচ্চাটার দিদিকে টুপি পরিয়ে ডাক্তার ডাকার নাম করে ধাঁ।
-বাচ্চাটার কী ট্রিটমেন্ট হল দেখলে না?
মাথা খারাপ? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। জুন ও বলে ফোনটা ছেড়ে দিল। চোখদুটো ভিজে এল। পাশেই অর্ক টিভিতে কার্টুন দেখছিল। জুন ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।
মোবাইলটা আবার বাজল। বুঝতে পারল সোম করছে। ধরল না। জাতে বাজতে থেমে গেল। আবার বাজল। ও এবা সুইচ অফ করে দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।
অর্ক কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে মাসির দিকে তাকিয়ে রইল।